হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১৩



সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ভূমিকা
- আর-রিবা বা সুদের পরিচয়
- আর-রিবার শ্রেণী বিন্যাস ও ধরন
- সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য
- সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১৩



সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- ভূমিকা
- আর-রিবা বা সুদের পরিচয়
- আর-রিবার শ্রেণী বিন্যাস ও ধরন
- সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য
- সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

সুদ নিষিদ্ধকরণ : প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

ভূমিকা

মানব জীবনে অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অর্থ ছাড়া জীবন ধারণ কঠিন। তবে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈধতা ও অবৈধতার মাঝে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী শরী'আহ যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে 'আর-রিবা' বা সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশী কঠোর। ইসলাম সব ধরণের সুদই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কাল পরিক্রমায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আদর্শ থেকে ছিটকে পড়ে সুদের রাহুগ্রাসে আজ নিপতিত। অথচ সুদ হচ্ছে মারাত্মক প্রতারণা, মানবতার দুশমন এবং শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সুদের ক্ষতিকর দিক কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও আঘাত হানে।

সুদের কারণেই সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতি শ্লথ করে দেয় । সুদমুক্ত অর্থনীতির তুলনায় সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদন কম হয়। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে গ্রাহক বিনা পরিশ্রম ও ঝুঁকিহীনভাবে নিশ্চিত সুদ পায়। এ অবস্থায় সঞ্চয়কারীদেরকে অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। সুদের ফলেই মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে পুঁজি সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। সুদ বেকারত্ব এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেয়।

সর্বোপরি সুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। বহমান প্রবন্ধে সুদের পরিচয়, প্রকরণ, সুদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার উন্মোচন এবং তা হারাম হওয়ার কারণ, প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সুদ উচ্ছেদের উপায় সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

১. আর-রিবা বা সুদের পরিচয়

'আর-রিবা' আরবী শব্দ। আল্-কুরআনে الرِّبَا এবং الرِّبَوا উভয়রূপে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আর-রিবা'র বাংলা প্রতি শব্দ হিসেবে সুদ শব্দ ব্যবহার করা হলেও এটি মূলতঃ ফারসী ও উর্দু শব্দ।

বাংলা অভিধানে একে কুসীদও বলা হয়েছে। আর ইংরেজীতে সুদের প্রতিশব্দ হল- Interest, Usury, Interest of loan, premium for the use of money, profit, Advantage, Any increase.
সুদের আভিধানিক অর্থ প্রবৃদ্ধি, আধিক্য, স্ফীতি চড়া বা বিকাশ, অতিরিক্ত, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। (**আল-মু'জামুল ওয়াসীত**, পৃ. ৩২৬)

জাহিলী যুগে আরব দেশে অর্থ ধার দেয়া হলে ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে আসলের ওপর পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। অনেকে দ্রব্য সামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং শর্তানুসারে অতিরিক্ত পণ্য ও শস্য ফেরত নিত। তদানীন্তন আরবে আসলের ওপর এই অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হত 'রিবা'। আল্-কুরআনে 'রিবা' শব্দকে সাধারণভাবে প্রচলিত এই অর্থই ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই জাতীয় সামগ্রী কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশী পরিমাণ নেয়া হলে অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় 'রিবা' বা সুদ। রাসূল (স.)-এর হাদীছে সুদের সংজ্ঞা ও বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এরই ওপর ভিত্তি করে মুসলিম পণ্ডিতগণ রিবাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

- রাসূল (স.) বলেন, (كل قرض جر نفعا فهو ربا) 'যে ঋণ কোন বৃদ্ধি আকর্ষণ করে তা-ই রিবা বা সুদ।' (ইমাম বায়হাক্বী, **আস-সুনান**, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫)
- মুজাহিদ রহ. (মৃ. ১০৩হি.) বলেন, "জাহিলী যুগের রিবা হল, এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে বলতো যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশী দিব।" (তাফসীরু তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২)
- কাতাদা রহ. (মৃ. ১১৮হি.) 'রিবা' সম্পর্কে বলেন, "কেউ কারো কাছে কোন জিনিস বিক্রি করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে তার দাম পরিশোধ করার একটি নির্দিষ্ট সময় দিত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে না পারলে বিক্রেতা পণ্যের দাম আরো বাড়িয়ে দিয়ে নতুন সময় নির্ধারণ করে দিত।" (সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, পৃ. ৮৬-৮৭)
- মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, 'চুক্তিবদ্ধ দু'পক্ষের যে কোন এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরী'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে রিবা বলা হয়।' (মাজমু' ক্বাওয়া'ইদিল ফিক্বহ, পৃ. ৩০২)
- ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, 'পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে সুদ। যেমন- এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার।' (ফতহুল বারী)
- ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) 'রিবা' সম্পর্কে বলেন, 'জাহিলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তারা এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়ে তার নিকট থেকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঋণ গ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হত। যদি সে আদায় করতে না পারত তা হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে

সময়সীমা বাড়িয়ে দিত।' (মাফাতিহুল গায়ব)

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, সমজাতীয় দ্রব্য হোক বা অর্থ হোক যদি ঋণ দেয়া হয় এবং ঋণ পরিশোধের সময় প্রদত্ত বস্তু বা অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত কোন বস্তু বা অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হলো তাকে বলা হবে 'রিবা' বা সুদ।

২. আর-রিবার শ্রেণী বিন্যাস ও ধরণ

আল্-কুরআন ও আল্-হাদীছে 'রিবা' বা সুদ সংক্রান্ত যে সমস্ত বাণী রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে 'রিবা' বা সুদকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. রিবান নাসী'আহ (ربا النسيئة) বা মেয়াদী সুদ।

খ. রিবাল ফদল (ربا الفضل) বা লেনদেনে অতিরিক্তজনিত সুদ ।

উল্লেখ্য যে, 'রিবান নাসী'আহ' এর অবৈধতা আল্-কুরআন দ্বারা এবং 'রিবাল ফদল' এর অবৈধতা আল-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ দু'ধরণের 'রিবা' ছাড়াও সমাজে আরো কিছু ধরণের 'রিবা'-এর প্রচলন রয়েছে। যেমন-

- কর্য গ্রহীতার কাছ থেকে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণমূলক 'রিবা'।
- কাঁচা ফলের বিনিময়ে শুষ্কফল এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিনিময়মূলক 'রিবা'।
- উৎপাদনশীল বা বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণমূলক 'রিবা'।

ক. রিবান নাসী'আহ (ربا النسيئة) বা মেয়াদী সুদের বর্ণনা

'নাসী'আহ' (النسيئة) শব্দটি আরবী 'নাসায়া' শব্দমূল থেকে উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ- স্থগিত, বিলম্বিত বা প্রতীক্ষা, অতিরিক্ত, বাড়তি অংশঃ.

- ইসলামী শরী'আর পরিভাষায় 'রিবান নাসী'আহ' এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেন, 'কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের

নিকট হতে কোন অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেওয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর মেয়াদ শেষে তা ফেরত দেওয়ার সময় পূর্বোক্ত শর্ত ও চুক্তি মোতাবিক উক্ত অর্থ বা দ্রব্যের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমাণ ঋণদাতাকে প্রদান করা হয় সেই অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবান নাসী'আহ' বলে।'

- ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী ও ড. হামিদ সাদিক 'রিবান নাসী'আহ' প্রসঙ্গে বলেন,

  الزيادة المشروطة مقابل الأجل خالية عن عوض مشروع

  'চুক্তির শর্ত মোতাবেক মেয়াদকালের বিপরীতে শরী'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল প্রদান করা হয় তাকে 'রিবান নাসি'আহ' (মেয়াদী ঋণ) বলে।'

- গাজী শামছুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হতে কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেওয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর, মেয়াদ শেষে চুক্তি মোতাবেক উক্ত জিনিসের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমাণ তাকে প্রদান করে সেই অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবান নাসী'আহ'(মেয়াদী সুদ) বলে।' (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন)

'রিবান নাসী'আহ' হচ্ছে ঋণের উপর সময়ের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশ। তা নগদ অর্থে হোক অথবা পণ্য আকারে হোক। যেমন - কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ শর্তে ১০০০ টাকা ঋণ প্রদান করল যে, এক বছর পর ১০% হারে ১১০০ (১০০০ +১০০) টাকা ফেরত দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত ১০০ টাকা হলো 'রিবান নাসী'আহ' (ربا النسيئة)। অনুরূপভাবে পণ্যসামগ্রী ঋণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে ১০০ কেজি গম ঋণ প্রদান করল যে, ছয় মাস পর ১১০ কেজি (১০০ + ১০ কেজি) গম ফেরত দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত ১০ কেজি গম হল 'রিবান নাসী'আহ' (ربا

النسيئة)। এটি শরী'আহ বিরোধী ব্যবসা- বাণিজ্য। মূলত: এর অবৈধতা আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। তাই আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।' (সূরাতুল বাকারাহ: ২৭৫)

জাহিলী যুগে 'রিবান নাসী'আহ' ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মুসলিম পণ্ডিতগণ 'রিবান নাসী'আহ'কে 'রিবাল কুরআন' (ربا القرآن) এবং 'রিবাল জাহিলিয়্যাহ' (ربا الجاهلية) বলেছেন।

খ. রিবাল ফদল (ربا الفضل) বা নগদ সুদের বর্ণনা

'ফাদল' (الفضل) শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। 'রিবাল ফদল' এর উদ্ভব হয় হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে। একই শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের পারস্পরিক লেন-দেন কালে একপক্ষ অপর পক্ষকে যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে তাকে 'রিবাল ফদল' বলে।

- ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী ও ড. হামিদ সাদিক 'রিবাল ফাদল' প্রসঙ্গে বলেন, 'একই জাতীয় খাদ্যশস্যের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়কালে একপক্ষ অপর পক্ষকে উহার যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে তাকে 'রিবাল ফাদল' বলে।'

(মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা, পৃ. ২১৮)

উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, কেউ যদি ৫০ কেজি উন্নতমানের চাউলের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ৫৫ কেজি চাউল গ্রহণ করে তাহলে এ অতিরিক্ত ৫ কেজি চাউল হবে 'রিবাল ফাদল'। জাহিলী যুগে আরবদেশে এ ধরণের বিনিময় প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কিন্তু আরবরা এরূপ বিনিময়কে সুদ বলে জানতো না এবং একে 'রিবা' বা সুদ বলতো না। রাসূল (স.) একে 'রিবা' বলে ঘোষণা করে এ ধরণের বিনিময় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। একই জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে গুণ ও মানগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকলেও লেন-দেনে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না। বরং সমান সমান বিনিময় করতে হবে। সুদের প্রচলন

রোধের উদ্দেশ্যে যে সকল ক্রয়-বিক্রয়ে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা রয়েছে তাও রাসূল (স.) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স.) বলেছেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

‘স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন লেন-দেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে সে সুদ লেন-দেনকারী সাব্যস্ত হবে। সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান অপরাধী।’ (মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা বিলাল (রা.) রাসূল (স.)-এর নিকট কিছু উত্তমমানের খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রা.) উত্তরে বললেন, আমাদের খেজুর খারাপ ছিল, তাই আমি আমাদের দুই সা’ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এক সা’ পরিমাণ ভাল খেজুর ক্রয় করে এনেছি। রাসূল (স.) বললেন, আহ এতো সুদ, এতো সুদ। কখনও এরূপ করো না। তোমরা যদি ভাল খেজুর পেতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে বিক্রয় করবে। তারপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় করে নিবে। (সহীহুল বুখারী)

উল্লেখ্য যে, এক প্রজাতির দ্রব্যের সাথে অন্য প্রজাতির দ্রব্যের কম বেশী করে লেনদেন করা হলে তা সুদ হবে না। যেমন- ৪০ কেজি চাউলের সাথে ৫০ কেজি গম বিনিময় করা হলে সুদ হবে না। যে সকল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে সে সকল দ্রব্যের পারস্পরিক লেন-দেনে কম বেশী করা

হলে তা সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে। ১. দ্রব্য দু'টি একই প্রজাতির হলে। ২. ওজন বা পরিমাপের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হলে।

সুতরাং একই জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে সমান-সমান (مِثْلاً بِمِثْلٍ) এবং নগদ (يَدًا بِيَدٍ) হতে হবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি নিম্নমানের দ্রব্যের পরিবর্তে মেয়াদান্তে উৎকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করে, নগদ লেনদেন না হওয়ার জন্যে 'রিবাল ফাদল' হবে না ঠিকই কিন্তু মেয়াদের জন্যে তা 'রিবান নাসি'আহ' বা মেয়াদী সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ. কর্য গ্রহীতার কাছ থেকে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণমূলক 'রিবা'

কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু ধার দেয় তবে ধারের বিনিময়ে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করে সেটিও সুদ হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল (স.) এরূপ হাদিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ধার দিলে ধারদাতা ধারগ্রহীতার নিকট হতে কোনপ্রকার উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না।' (মিশকাত)

ঘ. কাঁচা মালের বিনিময়ে শুষ্কফল এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের বিনিময়ে অনির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিনিময়মূলক 'রিবা'

রাসূলুল্লাহ (স.) কাঁচা ফলের বিনিময়ে শুষ্কফল বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে অনির্দিষ্ট পরিমাণ স্তুপীকৃত খেজুর বিক্রয় নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সুদের আশংকা রয়েছে। সা'ঈদ ইবন ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,শুকনা খেজুরের সাথে ভিজা খেজুরের বিনিময় কিভাবে করা হবে? রাসূল (স.) তখন প্রশ্ন করলেন, ভিজা খেজুর কি শুকিয়ে যাবার পর কমে যায়? প্রশ্নকারী উত্তরে বললেন, জি হাঁ। তখন রাসূল (স.) এ ধরণের বিনিময় করতে নিষেধ করলেন। (সুনানু আবি দাউদ)

ঙ. উৎপাদনশীল বা বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণমূলক 'রিবা'

কেউ যদি ব্যক্তিগত অভাব ছাড়াও উৎপাদনশীল বা বাণিজ্যিক খাতে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে সেটিও কুরআন, হাদীস ও মানবিক বিচারে সন্দেহাতীতভাবে হারাম হবে। কেননা লেনদেনের বৈধতা দাতা-গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল নয়। এছাড়া সুদ বা 'রিবা' সংক্রান্ত কোন আয়াতে ভোগ্য ঋণ এবং বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমণের বহু পূর্ব থেকেই বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণ প্রথা চালু ছিল।

৩. সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

জাহিলী যুগে সুদের সাথে মুনাফাকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছিল। সুদকে তখন মুনাফাই মনে করা হতো। আধুনিক বিশ্বেও এমন একটি অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তারা কাগজ পত্রে 'সুদ' এর স্থলে 'মুনাফা' ব্যবহার করে অবৈধকে বৈধ বানানোর অপচেষ্টা করছে। তাদের যুক্তি হলো, ব্যবসায়ে যেমন অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জিত হয়, সুদেও তেমনি অর্থই বিনিয়োগ করা হয়। দু'টোই অর্থ বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত অর্জন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক মনে হলেও আদর্শ, দর্শন, বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াগত বিবেচনায় সুদের সাথে মুনাফার দূরতম সম্পর্কও নেই। সুদ ও মুনাফা সম্পূর্ণ আলাদা, বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয়। সুদ ও মুনাফা সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করার লক্ষ্যে নিম্নে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

১. অর্থ ঋণ দিয়ে কিংবা সমজাতীয় কোন দ্রব্য সামগ্রীকে পারস্পরিক বিনিময় করে শর্তভিত্তিক অতিরিক্ত গ্রহণ করাই হলো সুদ। অপরপক্ষে মুনাফা হলো উৎপন্ন কিংবা ক্রয়কৃত সামগ্রীকে বিক্রি করে বিক্রয় মূল্য থেকে উৎপাদন খরচ কিংবা ক্রয়মূল্য বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকে সেটিই মুনাফা। যেমন- এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ৫ কেজি চাউল ধার দিল এই শর্তে যে, ৬ মাস পর তাকে ৬ কেজি চাউল ফেরৎ দিবে। এতে দাতার ১ কেজি চাউল লাভ

হলো। এখানে এই অতিরিক্ত ১ কেজি চাউল হল 'রিবা' বা সুদ। অপরপক্ষে এক ব্যক্তি পাইকারী বাজার থেকে ১৮০ টাকায় ৫ কেজি চাউল ক্রয় করে উক্ত চাউল ২২০ টাকায় অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করল। এতে তার ৪০ টাকা লাভ হল। এই ৪০ টাকাই হল মুনাফা।

২. ইসলামে সর্বপ্রকার সুদ হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা এর অবৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত। পক্ষান্তরে মুনাফা বৈধ। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাও এটি প্রমাণিত।

৩. সুদের সম্পর্ক ঋণ, সময় ও বিনিময়ের সাথে। অপরপক্ষে মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে।

৪. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকেও পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং টাকা পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. সুদ নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয়। এতে কোন প্রকার ঝুঁকি নেই। ঋণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে-আসলে ফেরত পাবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ঋণ গ্রহীতার লাভ হোক বা না হোক এটা তার দেখার বিষয় নয়। অপরপক্ষে মুনাফা অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত আয়। এতে লাভ-ক্ষতি উভয়ের ঝুঁকি থাকে। বিক্রেতার লাভ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

৬. সুদ যুলুমের বাহন, মানবতা বিরোধী। যে কোন মূল্যে সুদ আদায়ের প্রচেষ্টা মানুষকে যালিমে পরিণত করে।

অপরপক্ষে মুনাফা ইনসাফের বাহন, মানবতার সমর্থক। পারস্পরিক সম্মতিতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে মুনাফা ধার্য করা হয়ে থাকে। এর সাথে জড়িত থাকে দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা।

৭. সুদ মানুষকে জনকল্যাণে অর্থ ব্যয়ে নিরুৎসাহিত করে ও মানুষকে কৃপণ বানায়। আর মুনাফা মানুষকে জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ যোগায় এবং

মিতব্যয়ী ও দানশীল ব্যক্তিতে পরিণত করে।

৮. সুদের অভিশাপ মানুষকে অপকর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে। সুদ সামাজিক অবক্ষয় তৈরী করে। পক্ষান্তরে মুনাফা মানুষকে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

৯. সুদ ধনী গরীবের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সম্পর্ক তৈরী করে, আর মুনাফা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করে।

১০. মানুষ সুদের আশায় অর্থ বা মূলধন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে সুদে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। তাই সুদ হলো উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিরাট বাঁধা। পক্ষান্তরে মুনাফা বিনিয়োগের দ্বার খুলে দেয় এবং উৎপাদন বাড়ায়। কেননা মুনাফার জন্য মানুষকে উৎপাদন করতে হয়।

১১. সুদ উৎপাদনে স্থবিরতা আনে ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করে, কিন্তু মুনাফা দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

১২. সুদ দ্রব্যমূল্য বাড়ায়। কেননা উৎপাদনকারী নিজস্ব মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যে সুদের হারও যোগ করে। পক্ষান্তরে মুনাফা দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখে।

১৩. সুদে কর্মসংস্থান কমে যায় বলে চাহিদার চেয়ে শ্রমিক বেশি হয়। তাই সুদ মজুরি হ্রাস করে। পক্ষান্তরে মুনাফা উৎপাদন বাড়ায়, আর উৎপাদনে তৈরী হয় নতুন নতুন কাজের সুযোগ। ফলে মুনাফা ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করে আর সুদে কর্মসংস্থান কমে যায়।

১৪. সুদের মাধ্যমে বেকারত্ব বাড়ায়। কেননা সুদে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়। কলকারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন কমে যায়। কিন্তু মুনাফা শিল্পায়নে গতি আনে। নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। ফলে কর্মসংস্থাপনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর হয়।

১৫. নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না হলে ঋণদাতা ঋণের উপর একাধিকবার সুদ

ধার্য ও আদায় করতে পারে, যাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে। কিন্তু মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে পণ্যের ওপর একাধিকবার মুনাফা ধার্য করতে পারে না।

১৬. সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। সুদের হার কখনো শূন্য হয় না। অপরপক্ষে মুনাফার হার কখনও শূন্য, এমনকি ঋণাত্মকও হতে পারে।

১৭. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না। আর মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

১৮. সুদ হলো এক পক্ষের লাভ। কেবল ঋণদাতা সুদের টাকা পায়। পক্ষান্তরে মুনাফা কখনোই এক পাক্ষিক নয়। ক্রেতা মুনাফা পায় পণ্যে আর বিক্রেতা মুনাফা পায় পণ্যের বিক্রিতে। কোন পক্ষই বঞ্চিত হয় না।

৪. সুদ (রিবা) নিষিদ্ধকরণের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সকলপ্রকার সুদকে ইসলাম অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার মধ্যে কল্যাণ ও উপকারিতার লেশমাত্র নেই। সাপ, বিচ্ছু, বাঘ ও সিংহের মত হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। এমনিভাবে চুরি, ডাকাতি, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কারো না কারো উপকারিতা থাকতে পারে। তবে আমাদের দেখতে হবে কোন্ জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম। যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম সে জিনিসকেই আমরা উপকারি বস্তু বলে গ্রহণ করতে পারি।

আর যে জিনিসের ক্ষতি বেশি এবং উপকারিতা কম সে জিনিসকে উপকারি বস্তু বলে গ্রহণ করতে পারি না। অনুরূপভাবে বস্তুর উপকার, অপকার, ভাল-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি তুলনা করার সময় আমাদের দেখতে হবে যে, বস্তুর উপকার এবং অপকার এতদুভয়ের মধ্যে স্থায়ী কোনটি? যদি উপকার অস্থায়ী হয় এবং অপকার স্থায়ী হয়, তবে একে আমরা উপকারি বস্তু হিসেবে গণ্য করতে পারি না।

এমনিভাবে কোন বস্তুর উপকার যদি ব্যক্তিকেন্দ্রীক হয় এবং ক্ষতির দায়-দায়িত্ব আপতিত হয় সমগ্র জাতির উপর তাহলে একেও আমরা কিছুতেই উপকারি বস্তু হিসেবে মেনে নিতে পারি না। চুরি, ডাকাতি এবং ঘুষের মধ্যে হয়তো চোর, ডাকাত এবং ঘুষখোরের উপকার থাকতে পারে। কিন্তু এ কর্ম সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতিকর, বিধায় একে আমরা ভাল কাজ বলে মনে করতে পারি না; বরং এটি গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। সুদের অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার হয় বটে কিন্তু এ উপকার একেবারেই অস্থায়ী একান্তই ব্যক্তিগত এবং এর কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণের পরিমাণ অনেক বেশি।

এর অপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী এবং গোটা জাতিকেই এর কুফল ও ক্ষতির বোঝা বহন করতে হয়। সুদ হচ্ছে একটি প্রতারণা ও শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সুদ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয় কুফল, যা মানব জীবনকে অশান্ত করে তোলে। তাই সুদের এই অবস্থা কখনও কল্যাণজনক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হতে পারে না। এ সকল কুফলের কারণেই ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

৪.১ সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে সুদের কুফল তুলে ধরে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো।

ক. সুদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা

মহান আল্লাহ আল-কুরআনের প্রায় পনেরটি আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে সুদকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়ে তা থেকে মু'মিনদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের একটি সারণী উল্লেখ করা হলো।

সুদ সম্পর্কিত আয়াতের সারণী

সূরাহর নাম	আয়াত নম্বর	আয়াত সংখ্যা
সূরাতুল বাকারাহ	২৭৫-২৮১	৭
সূরাহ আলে ইমরান	১৩০-১৩১	২
সূরাতুন নিসা	১৬০-১৬২	৩
সূরাতুল মায়িদা	৬২-৬৩	২
সূরাতুর রূম	৩৯	১
সর্বমোট আয়াত		১৫

রাসূল (স.) যখন এ পৃথিবীতে আগমন করেন তখন আরব বিশ্বে এমন কিছু সংখ্যক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল যা জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁর বান্দাদেরকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেন। এতে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত স্বাভাবিক রীতিনীতির বিলুপ্ত ঘটে, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর দেয়া দ্বীনেও ক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

এ মহাসত্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশ তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশকে বাতিল করতে আসে না বরং পরিপূর্ণ করতেই আসে। সুদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য।

'রিবা' বা সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনে প্রথম নাযিলকৃত আয়াত সূরাহ আর-রূমের ৩৯তম আয়াত। এ সূরাহটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

'মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।'

'রিবা' বা সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনে দ্বিতীয় নাযিলকৃত আয়াত সূরাহ আন-নিসার ১৬১তম আয়াত। এ স্তরে বলা হয়, সুদ খাওয়াটা ইহুদীদের কর্ম। তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে উপভোগ করছে। আল্লাহ বলেন,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

'ইহুদীরা সুদ নেয় এবং মানুষের মাল অবৈধভাবে খায়, অথচ এ থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।'

'রিবা' বা সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনে তৃতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াত সূরাহ আলে ইমরানের ১৩০তম আয়াত। এখানে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মু'মিনগণ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না, আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা কৃতার্থ হতে পার।'

এরপরও কিছুকাল পর্যন্ত মামুলী হারে সুদী কারবার জারি ছিল। রাসূল (স.) তায়েফ অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তা দ্বারাও বুঝা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুদী কারবারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। (কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৯৪)

মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

'যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এজন্য যে, তারা বলে 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই'। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ার। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিপাত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।' (সূরা আল বাকারাহ-২৮১)

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেন এতোটাই মারাত্মক অপরাধ যে, সুদের লেনদেন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য।এছাড়া আল-কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় সেই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে সুদের মধ্য থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো।' (সূরাতুল বাকারাহ: ২৭৮)

'রিবা' সংক্রান্ত আয়াত ও তার তাফসীর থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহর (স.) মাক্কী জীবনেই সুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সুদ হারাম করে আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছ তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কোন এক সময়ে।

সুদ সম্পর্কিত আল-কুরআনের নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি রাসূল (স.)-এর ৪০টিরও অধিক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণিত। সুদখোরদের প্রতি রাসূল (স.) অভিশাপ দিয়েছেন। জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। রাসূল (স.) আরো বলেন, পাপের দিক দিয়ে তারা সমান অপরাধী। (সহীহুল বুখারী, সহীহুল মুসলিম, জামি'উত তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবন হানযালাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, সুদের মাত্র

একটি রৌপ্য মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায়, তার গুনাহ ৩৬বার (ছত্রিশ) যিনা করা অপেক্ষা বেশী হয়। (মুসনাদু আহমদ)

সুদ হারাম, কিন্তু তা কোন পর্যায়ের? পৃথিবীতে যত প্রকার হারাম কাজ রয়েছে তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য হারাম হলো নিজ মাকে বিয়ে করা এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নজিরহীন। আর সুদ খাওয়া তারই সাদৃশ্য। রাসূল (স.) বলেন, সুদের মধ্যে ৭৩ (তিহাত্তর) প্রকার গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় (পাপ)।(সুনানু ইবন মাজাহ)

উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য হলো, মাকে বিবাহ করা বা মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যেমন ঘৃণ্য, জঘন্য, অমানবিক ও অসভ্য কাজ, সুদের লেন-দেনও তেমনি এবং তার চেয়েও বেশি জঘন্য কাজ।

সুদ হলো ইবাদত কবুলের অন্তরায়। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, লোকদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন (সুদী কারবার ব্যাপক হয়ে পড়বে, এমন কি) একটি লোকও সুদের ব্যবহার হতে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধোঁয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ)

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, মি'রাজ রজনীতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলাম যাদের পেট এক একটি ঘরের ন্যায় স্ফীত ও বিস্তৃত। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো পেটের বাইরে থেকেই দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সুদখোর সম্প্রদায়। (সুনানু ইবন মাজাহ)

এভাবে কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে সুদের কুফলের বর্ণনায় শুধু পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে মানবতার কোন কল্যাণ নেই। এছাড়া সুদের অবৈধতা ও তা বর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

খ. সুদ নিষিদ্ধকরণের নৈতিক তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা

সুদভিত্তিক বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকারী কোন ঝুঁকি বহন করা ছাড়াই নিশ্চিত ও পূর্ব নির্ধারিত লভ্যাংশ পান। কিন্তু যারা সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে ব্যবসায় নিজেদের সময়, শ্রম, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শরীরের ঘাম ঝড়িয়ে ব্যবসায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখে তারা মুনাফার কোন নিশ্চিয়তা পান না। এমনকি মুনাফা যদি নাও হয় তারপরও তাকে মূলধন দিয়ে হলেও সুদখোর মহাজনের মুনাফা পরিশোধ করে সর্বস্বান্ত হতে হয়। কোন বিবেকবান মানুষই এটা সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এই অযৌক্তিক বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র।

নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, সুদ মূলত স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা প্রভৃতি মন্দ চরিত্রের ফল। একটি পণ্য একবার বিক্রি করার পর তাতে বারবার মুনাফা লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু সুদভিক্তিক ব্যবসায় বিক্রিতব্য পণ্যের উপর চক্রবৃদ্ধিহারে অসংখ্যবার মুনাফা লাভের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ বিবেচনায় এমন হওয়া উচিত নয়।

এছাড়া সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ-লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অধিক সুদ পাওয়ার আশায় সে এতোই মত্ত হয়ে ওঠে যে, তার ভাল-মন্দের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ফলে সে কারো উপকার করে না। নিজ চেষ্টায় পুঁজি বিনিয়োগ করে কেউ বড় হলে বা সুদখোরের সমতুল্য হয়ে গেলে সে তাও সহ্য করতে পারে না। তাই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়। সুদ হচ্ছে উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

গ. সুদ নিষিদ্ধকরণের সামাজিক তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের প্রধান তাৎপর্য হলো, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি অত্যন্ত বড় ধরণের যুলুমমূলক ব্যবস্থা। ঋণগ্রহীতার সুবিধা-অসুবিধা, সক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনায় না এনে যে কোন মূল্যে সুদখোর মহাজন তার মূলধন ও সুদ আদায়ের চেষ্টা করে। ফলে প্রায়শঃ সমাজে মারা-মারি, হানা-হানি, হিংসা বিদ্বেষসহ বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগকে হ্রাস করে দেয়। বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে অধিক সুদ তথা অবৈধ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মত্ত থাকে। তাই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমাজে লোকদের পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের গুটিকতক লোকের হাতে অর্থ পুঞ্জীভূত হয়। সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয় । দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং একটা বিশেষ ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সুদ সমাজের অসহায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদেরকে ঋণের ভরে জর্জরিত করে। কারণ ঋণগ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদে-আসলে পরিশোধ করতে না পারে তখন সুদখোর মহাজন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। তাই সুদ সমাজের অসহায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়। মানুষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে। ফলে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। সঠিক চিকিৎসা ও খাবার তাদের ভাগ্যে জোটে না বলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বাস্থ্যও হারিয়ে ফেলে। এ জন্যই রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা ঋণ থেকে বেঁচে থাক। কেননা ঋণ হলো রাতের দুঃশ্চিন্তা ও দিনের অপমান।" (শু'আবুল ঈমান)

সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুদের টাকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে নিঃস্ব হয়ে যায়। তারা যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্খায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, কালোবাজারী, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অনৈতিক কাজ শুরু করে। অনেক মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও

বিত্তহীন পরিবারের মেয়েরা পেশাদারি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এভাবে সুদের বিষবাষ্পে সমাজে চালু হয় উপার্জনের নানা নীতিহীন পথ। ফলে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও অবকাঠামো বিনষ্ট হয়।

ঘ. সুদ নিষিদ্ধকরণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা

সুদ সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে কর্মবিমুখ করে। কারণ বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে জনগণ অর্থকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখে এবং সুদে খাটায়। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা জাতীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে। এছাড়া এটি ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে। আর হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এমনিভাবে সুদের হার যদি শূন্যের কোঠায় নেমে আসে তাহলে বিনিয়োগে বিপুল গতি সঞ্চারিত হয়। অধিক হারে সুদ দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব বানাবার সুযোগ করে দেয়। অর্থাৎ সুদ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়।

সুদের ভিত্তিতে মূলধন নিয়ে যারা কলকারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালায় তারা নিজেদের মূলধন বা মুনাফার অংশ থেকে সুদ দেয় না। তারা সেটা পণ্যের মূল্যের উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এই সুদ কার্যত ভোক্তাসাধারণকেই দিতে হয়। তাই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদের হার যত বেশি হয়, দ্রব্যমূল্য তত বেড়ে যায়। সুদ জাতীয় অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে।

৫. সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষা করার উপায়

সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে সুদ নামক কুপ্রথা সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। আর এজন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. সরকার কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে

দীর্ঘদিন ধরে সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু রয়েছে। এ পদ্ধতি রহিতকরণের অভিপ্রায়ে সরকারীভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যে আইনের মাধ্যমে সুদ ব্যবস্থা স্বীকৃত ঐ আইনকে বাতিল করে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২. **ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন:** সুদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হলে ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। অবশ্য ১৯৬৩ সালে মিশরে আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক চালু হবার পর এর সফলতা দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ওআইসি (ওওঈ)-এর অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (ওউই) নামে মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে অর্থমন্ত্রীদের ইসলামী সম্মেলনে এ ব্যাংকের সনদ স্বাক্ষর করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবরে সৌদিআরবের জেদ্দা নগরীতে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (ওউই) কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর বিস্ময়কর সুফল দেশবাসীকে ইসলামী লেন-দেন ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে।

এ কথা আজ অবিসংবাদীত সত্য রূপে প্রমাণিত যে, বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি শুধু সফলই প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলির চাইতে অধিকতর যোগ্যতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমেটেড' বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে আরও বেশকয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. **করযে হাসানা ও মুদারাবাহ ব্যবস্থার প্রবর্তন:** শুধুমাত্র মূলধন ফেরৎ দেয়ার শর্তে যে ঋণ প্রদান করা হয় সেটিই হলো 'করযে হাসানা'। আর 'মুদারাবাহ' হলো এমন এক প্রকার ব্যবসা, যে ব্যবসায় একপক্ষ ব্যবসার মূলধন সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ ঐ মূলধন বিনিয়োগ করে স্বীয় শ্রম ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে। এভাবে একজনের পুঁজি ও অপরজনের দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাই 'মুদারাবাহ'। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্বাহ্নে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক উভয়পক্ষ তা ভাগ করে নেয়। আর ব্যবসায়ে লোকসান হলে সম্পূর্ণ আর্থিক লোকসানের বোঝা পুঁজির মালিককে বহন করতে হয়।

সমাজের বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থান কিংবা পূনর্বাসনের ব্যবস্থাস্বরূপ তাদের জন্যে করযে হাসানা ও মুদারাবাহ পদ্ধতি চালু করতে হবে। আমাদের দেশে এই বিধানটি প্রায় অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটিভিত্তিক মুদারাবাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দুটি দেশে মুসলমানেরা কিছুটা হলেও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে। বস্তুতঃ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র হতে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে সমাজের বিত্তশালী লোকদেরকে করযে হাসানা ও মুদারাবাহ পদ্ধতির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪. **যাকাত আদায় ও বণ্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ:** যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় মানুষের অর্থ-কড়িকে অলস না রেখে বিনিয়োগ করে সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট হারে বছরান্তে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হওয়ায় কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তি তার সঞ্চিত অর্থকে অব্যবহৃত রাখে না; বরং সকলেই সচেষ্ট থাকে তার অর্থকে উৎপাদনমূলক কাজে

বিনিয়োগ করার জন্যে।

৫. **পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি অন্তর্ভুক্তকরণঃ** সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতির ওপর সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যে ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তথা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য হলো, শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান-আক্বীদার কোন সংমিশ্রণ নেই। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোন স্তরেই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোনও সুযোগ নেই। এই অবস্থার আশু নিরসন হওয়া দরকার।

৬. **ইসলামী অর্থনীতিতে উচ্চতর গবেষণার পথ সুগমকরণঃ** ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন শাখাকে অনার্স বা সম্মান শ্রেণীর স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে ইসলামী অর্থনীতি বোঝার এবং এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার পথ সুগম করতে হবে।

৭. **গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ** ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল ইসলামী অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমেঃ বাংলাদেশের প্রচার ও গণসংযোগ মাধ্যমসমূহ বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রকে সুদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জন্য দূর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম ইসলামী আদর্শ ও চেতনার পরিপন্থী। বস্তুতঃ দেশের প্রচার ও গণসংযোগ মাধ্যমগুলি সংস্কার করে ইসলামী আদর্শ সম্প্রচার ও পরিবেশন করা হলে জনগণ ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে

সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করবে।

খ. লেখনীর মাধ্যমে: ইসলামী অর্থনীতির ওপর বই-পুস্তকসহ ব্যাপক লেখা-লেখি করার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।

গ. মসজিদে খুতবার মাধ্যমে: বাংলাদেশে তিন লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে। বছরে বায়ান্ন দিন মুসলিম জনগণ জুম'আর সালাতে মসজিদে উপস্থিত হন। এই সালাতের খুতবায় যদি খতিব বা ইমাম সাহেব ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের পাশা-পাশি সুদী অর্থনীতির কুফল এবং ইসলামী অর্থনীতির সুফল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন তাহলে আশা করা যায় ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

ঘ. সভা-সমাবেশের মাধ্যমে: দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐসব অনুষ্ঠানে হাজার হাজার, লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়। বরেণ্য উলামায়ে কিরাম এতে বতৃতা করে থাকেন। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির উপযোগিতা এবং সুদের অভিশাপ থেকে জাতির মুক্তির উপায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয় তাহলে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠবে।

ঙ. গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণের মাধ্যমে: গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের পাশা-পাশি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন তাহলে গণসচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে।

চ. ইসলামী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে: সুদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হলে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো আব্যশক। সুদ যে শোষণের অন্যতম হাতিয়ার তা বুঝতে হলে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

৮. **গণপ্রতিরোধ গঠন:** সুদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে নিম্নের

পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ: যারা সুদের সঙ্গে জড়িত তাদের সাথে ধীরে ধীরে সম্পর্কছেদ করতে হবে। তাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে নিজের ছেলে-মেয়ে ও নিকটাত্মীয়দের বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারা যেন বুঝতে পারে যে সুদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সংগ ত্যাগ করছেন বা তাদের এড়িয়ে চলছেন। অর্থাৎ তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

খ. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো: ঋণ খেলাপীদের মত সুদখোরদেরকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার আইন করতে হবে। আর এ আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত সুদখোর ব্যক্তিরা জনপ্রতিনিধিত্ব হওয়ার জন্য ভোটে প্রার্থী হলে তাদের যেন ভোট দেওয়া না হয় সেজন্যে জোর প্রচারণা চালাতে হবে।

গ. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে: সুদখোরেরা জনগণের ওপর বিভিন্নভাবে যুলুম নির্যাতন করে থাকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঘ. সুদের পরিবর্তে জরিমানা নির্ধারণ : সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো বাতিল করার জন্যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন- জমির খাজনা, ট্যাক্স যথাসময়ে দিতে না পারলে তার ওপর সুদ দিতে হয়। সুদের পরিবর্তে জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে।

উপসংহার

ইসলামসহ পৃথিবীতে প্রচারিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মেই সুদের অপকারিতা তুলে ধরে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাশীল ও গবেষকগণ যুগে যুগে সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপীলেট বেঞ্চ তার ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে। রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, পুরোপুরি অবৈধ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সুদ সন্দেহাতীতভাবে হারাম। সুদের ক্ষতিকর প্রভাব আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। সর্বোপরি সুদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। আধুনিক বিশ্বের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ সমবেতভাবে সুদকে মানবতার জন্য একটি অভিশাপরূপে চিহ্নিত করে এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন। ইসলামে যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে শব্দগত দিক থেকেই হোক কিংবা অর্থের দিক থেকেই হোক সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশী কঠোর। তাই সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সুদকে সমুলে উচ্ছেদ করে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

নোট